ক্ষুব্ধ ঈশানী ঝড়ে : হেমাঙ্গ বিশ্বাস

শ্যামলচন্দ্র দাস

আসল কথা শুরুর আগে

Webster (1983) অভিধান অনুযায়ী 'music is the science of art ordering tones or sounds in succession, in combination and temporal relationship to produce a composition having unity and continuity as well as rhythm, melody, and harmony as its elements'. গান আসলে অতিজ্ঞাপনের প্রকাশ মাধ্যম। 'Music articulates froms which language can not set forth' (প্রকাশ বা ব্যাখ্যা করা)। যেহেতু এর অভিকরণে সুর, তাল, লয়, ইত্যাদি প্রয়োগ হয়ে থাকে। অবশ্য ভালো কবিতাও অতিজ্ঞাপনের বিষয় হয়ে উঠতে পারে। কারণ সুর, স্বর,ধ্বনি, বাণী, ছন্দ, লয়, বিরাম বা যতি তথা নৈঃশব্দ ইত্যাদির বিগর্ভন। যাইহোক, কবি-গীতিকার হেমাঙ্গ বিশ্বাস (জন্ম: ১৪ জানুয়ারি ১৯১২ - মৃত্যু : ২২ নভেম্বর ১৯৮৭)-এর গানগুলির ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

বিশ্বাস্য হেম-অঙ্গ : জীবনে-মরণে

সিলেটের হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলার পশ্চিম মিরাশী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হরকুমার বিশ্বাস, একজন প্রতিষ্ঠিত ছোট্ট জমিদার ছিলেন। মাতার নাম সরোজিনী দেবী। তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন হবিগঞ্জ হাইস্কুল থেকে। বাবার প্রজাশোষণের প্রতিবাদ করে তরুণ বয়সে গৃহত্যাগও করেন। তখন থেকেই তাঁর গণসচেতনতা ও গণসংগীত চর্চা। একদা শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজে ভর্তি হন। এই সময় থেকে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৩২-এ কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। এই সময় কারাবরণ করেন এবং যক্ষ্মা রোগ হয়, যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে কিছুকাল চিকিৎসাও করেন। ১৯৩৫-এ কারামুক্তি। এইসময় অসমিয়া গীতিকার-সংগঠক জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার সংস্পর্শে আসেন। ১৯৩৮-৩৯-এ ভারতীয় গণনাট্য সংগঠন (IPTA) গঠন করেন, বিনয় রায়, নিরঞ্জন সেন, দেবব্রত বিশ্বাস প্রমুখের সহযোগিতায়। ১৯৪২-এ কোলকাতায় বাংলার প্রগতিশীল লেখক শিল্পী সংঘের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ

হয়, এই সংঘের অনুরোধে সংগীত পরিবেশনও করেন একসময়। বাংলার প্রগতিবাদী সাংস্কৃতিক কর্মীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রী বিশ্বাসসহ নির্মলেন্দু চৌধুরী, রমেশ শীল, সলিল চৌধুরী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, তুলসি লাহিড়ী, শম্ভু মিত্র, অরুণ মিত্র, সুকান্ত ভট্টাচার্য, নিবারণ পন্ডিত প্রমুখ। ১৯৪৩-এ জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালাকে সঙ্গে নিয়ে সিলেট গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৮-এ পুনরায় গ্রেপ্তার হন তেলাঙ্গানা আন্দোলন চলার সময়। তিন বছর বন্দী থাকেন। ১৯৫১-তে মুক্তি পান। ১৯৫৬-তে চিকিৎসার জন্য চিনে যান, প্রায় আড়াই বছর সেখানে থাকেন। অবশ্য আরও একবার চিনে গিয়েছিলেন। জানা যায়, চিনা ভাষায় তাঁর অনেক গানও আছে। ১৯৭১-এ 'মাস-সিঙ্গারস' নামে একটি গণসংগীতের দল গঠন করেন এবং এই দল নিয়ে তিনি গ্রামে গ্রামে একসময় গান গেয়ে বেড়াতেন।

বিষাণ (গানের সংকলন, ১৯৪৩) 'হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান' (১৯৮০) এবং 'শঙ্খচিলের গান'(স্বরলিপিসহ, ১৯৭৫) তাঁর গানের সংকলন হিসাবে উল্লেখ্য। বাংলা ও অসমিয়া ভাষায় তাঁর লিখিত গ্রন্থ লোকসংগীত সমীক্ষা। এছাড়া 'কুল খুরার চোতাল' (অসমিয়া কাব্য,১৯৭০), 'আকৌ চীন চাই আহিলো' (অসমিয়া, ১ম-১৯৭৫, ২য় -১৯৭৭), জীবনশিল্পী জ্যোতিপ্রসাদ (১৯৮৩), 'লোকসংগীত সমীক্ষা' (বাংলা ও অসমিয়া, ১৯৭৮), হেমাঙ্গ বিশ্বাস রচনাবলী (প্রকাশক - অসম প্রকাশন পরিষদ, ২০০৮) ইত্যাদি ধর্তব্য। মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে মৈনাক বিশ্বাস সম্পাদনা করেন, 'উজান গাঁঙ বাইয়া', 'গানের বাহিরানা' (১৯৯৮)। কয়েকটি এম পি থ্রি- সি ডি ক্যাসেটও প্রসঙ্গত উল্লেখ্য।

হেমাঙ্গাভিমত : গণসাংগীতিক তত্ত্বালোচনা

বাংলার চিরায়ত সম্পদ লোকসংগীতের ধারাকে কেন্দ্র করেই হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গানের কথা ধনুকের ছিলার মতো। গানের টঙ্কারে ঝংকার ওঠা অনিবার্য। তাঁর গানে কেঁপে উঠত মসনদ, জেগে উঠত নিম্নবর্গীয় আমআদমি শ্রোতা। তাঁর সুরধ্বনি আজও মুক্তিকামী মানুষের প্রেরণামুখ। বৈশ্বিক শ্রমজীবি মানুষের সংগ্রামকে এনেছেন তিনি গানের ভাবে-ভাষায়। তবে তিনি শুধু শিল্পী, গীতিকার, সংগ্রাহক, সুরকারই নন, গানের একজন তাত্ত্বিক গবেষকও। গীতিকারের গানে মূলত বিদ্রোহ, প্রতিবাদই বিঘোষিত। কবিদের সঙ্গে তুলনা করলে বলা যায়, তাঁর প্রতিবাদের ঢঙ কখনো নজরুলীয়, কখনো সুকান্তীয়, কখনো বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ী গোছের। তবে এদের প্রতিবাদের ধরনের সবটাই কখনও এক হতে পারে না।

গণসংগীত বিশ্বজনীন মানুষের লড়াইয়ের একটি ভাষা।

> বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম স্বদেশ-চেতনা এবং পরাধীনতার বেদনাবোধে যে গীতের জন্ম তাকে আমরা স্বদেশী সংগীত কিংবা দেশাত্মবোধক সংগীত বলে থাকি। সেই স্বদেশী সংগীতের একটা বড় অংশ ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদের প্রভাবে আচ্ছন্ন ছিল। অনেকসময় আবার জাতীয় চেতনা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের আদর্শে প্রভাবিত ছিল। সেসব গানে দেশাত্মবোধের আবেদন ও বেদনা থাকলেও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহের চেতনা

ছিল না। দেশের মুক্তির সঙ্গে শোষণমুক্তির চিন্তার মিলন ঘটেনি।... স্বদেশ চেতনা যেখানে গণচেতনায় মিলিত হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার ভাবাদর্শের আকারে মিশলো সেই মোহনাতেই গণসংগীতের জন্ম। অন্যত্র তাঁর অভিমত, স্বাদেশিকতার ধারা যেখানে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার মহাসাগরে গিয়ে মিলেছে, সেই মোহনায় গণসংগীতের জন্ম।

গণসংগীত মানুষের বিপ্লবী লড়াই-এর তাপেই গড়ে ওঠে। বোঝা গেল, আমেরিকার রেললাইন শ্রমিক, হিরোশিমা নাগাসাকির ধ্বংসযজ্ঞ, ৪৬-এর নৌ বিদ্রোহ, দুর্ভিক্ষ নিয়েও নতুন সংগীত রচনা করে মানুষকে স্বপ্ন দেখানো যায়। যদিও এগুলির প্রভাব ছাড়াও তেভাগা আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, অক্টোবর বিপ্লব, কমিউনিস্ট দর্শনের প্রভাব এদেশে গণসংগীতের নতুন ধারা তৈরি করে। যা খুব স্পষ্টভাবে সাম্রাজ্যবাদ ও শ্রেণিগত শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রামের চেতনাকে ব্যক্ত করে। কথা, সুর সহযোগে। গণনাট্য সংঘ এক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। সলিল চৌধুরী ও হেমাঙ্গ বিশ্বাস, বিজন ভট্টাচার্য্য, ঋত্বিক ঘটক ছিলেন এমন তৎপরতার নেতৃত্বে অবতীর্ণ। এ ধারাবাহিকতা পরে অবশ্য অক্ষুন্ন থাকেনি। এই গণআন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়লে গণসংগীতের ধারাও ধীরগামী হয়ে পড়ে।

তাঁর 'গানের বাহিরানা' (জানুয়ারি, ১৯৯৮) গ্রন্থে অনেকগুলো নতুন ও পুরাতন লেখায় জনসমষ্টির সংগীত জীবন আর তার সঙ্গে শাস্ত্রীয় সংগীত ও গণসংগীতের সম্পর্ক-সংযোগ বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রাণ ও গানের জগতকে অভিন্নরূপে দেখেছেন এবং তাকে আবিষ্কার করেছেন সকল ঘরানার উর্ধ্বে। আবার বিভিন্ন ঘরানার সঙ্গে এর যোগও যে বিদ্যমান তাও স্বীকার্য। তিনি বলছেন 'গায়কিটা জলমাটি হাওয়ার, কিংবা পাহাড় ও উপত্যকার। গুরু একজন নয়— গণসমষ্টি। সুরের লহরের তুলিতে আঁকা সামগ্রিক সমষ্টিজীবনের চিত্রপট থাকে চোখের সামনে। একটি বাদ দিয়ে আরেকটিকে উপলব্ধি করা যায় না'। তাত্ত্বিক হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতে, '(অখন্ড) বাংলাদেশের পূর্ব্ববঙ্গের মূল/ মেলোডি হলো ভাটিয়ালি, উত্তরবঙ্গের তেমনি ভাওয়াইয়া, মধ্যবঙ্গের মূল গীতরীতি হল বাউল।' তাই তাঁর সিদ্ধান্ত, গণসংগীত জনগণের এই প্রাণের সুর ও কথার উপর ভিত্তি করেই বিকশিত হতে পারে।

তাঁর মতে 'লোকসংগীত শুধু অতীত সন্ধানী নয়, লোকসংগীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতিষ্ঠান'। সেজন্য লোকসংগীত বা নির্দিষ্ট অঞ্চলে পরম্পরায় টিকে-থাকা ভাব ভাষা-অভিব্যক্তির উপর ভর করেই গণসংগীতের মূল স্রোত তৈরি হয়। আমার নিবেদনের মুখ্য কথা, লোকসংগীত আয়ত্ত করতে হলে একাত্ম হতে হবে। সেটা জীবনে জীবন যোগ করার সমস্যা। উৎপাদক মেহনতি মানুষই লোকসংগীতের স্রষ্টা। যে অন্নদাতা সেই সুরদাতা। যে হাত লাঙলের খুঁটি ধরে, যে হাত নৌকার বৈঠা ধরে, গুণ টানে, যে হাত জাল বোনে, সেই হাতই দোতারা বানায়, সেই হাতেই ঢোলের বোল ওঠে। সেই অবিচ্ছিন্ন জীবন থেকে সুরকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করলে ভুল হতে বাধ্য।' এই সাধারণ আম আদমিই লোকসংগীত ও গণসংগীতের স্রষ্টা ও পরিপোষক। শ্রী বিশ্বাসের মতে,

অর্ধাহার অনাহারের মধ্যেও জনতার মাঝখান থেকে অসংখ্য শিল্পী তৈরি হচ্ছেন, শহরের

সংগীতবিদদের কাছে তাঁরা অজ্ঞাত।... আব্বাউসদ্দিনকে তাঁরা জানেন—জানেন না টেপু মিঞা বা বায়ন শেখদের। শচীনদেব বর্মণকে জানেন, কিন্তু নিরঞ্জন সূত্রধর বা কুনিয়া শীল বা মহানন্দ দাসদের কেউ জানেন না — যাঁরা শচীনদেব বর্মণের চেয়ে অনেক উঁচুদরের লোকশিল্পী। তাই গণপ্রতিভা আবিষ্কারের সাধনা নিয়েই গবেষকদের ডুব দিতে হবে জনসমুদ্রে।

শিল্পে ব্যক্তিগত সাফল্য, প্রতিষ্ঠা, যশ তাদের আরাধ্য নয়, সমষ্টির লড়াইয়ে নিজের ক্ষমতা যোগ করে ব্যক্তিকেও নিতে হয় জীবনের ঝুঁকি। সেখানে প্রচলিত বিত্ত বৈভবের স্থলে অনটন, নিশ্চিত জীবনের বদলে দারিদ্র ও বঞ্চনা, জেল জুলুম সব কিছুরই সম্ভাবনা থাকে। তা থাকলেও ব্যক্তির শিল্প-সংগীতের সাধনা যে সমষ্টির জন্যই। হেমাঙ্গ বিশ্বাস তেমনই এক শিল্পী।

'শোষকশ্রেণির ভাবাদর্শের সঙ্গে সংঘাতই লোকসংগীতের বিচার ও বিকাশের মূল চালিকা-শক্তি। কিন্তু এদেশে, বিশেষত বাংলার লোকসংগীত জীবন-বিমুখী অধ্যাত্মবাদের দ্বারা এমন আচ্ছন্ন কেন?' কিন্তু প্রশ্ন জাগে, লোকসংগীত তার (কৃষক বিদ্রোহের) প্রতিধ্বনি সেরকম আমরা পাই না কেন? তিতুমীর, দুদু মিঞা বা সমশের গাজীদের নিয়ে 'ব্যালাড' বা গীতিকা পেলাম না কেন? ভাবজগতে অধ্যাত্মবাদের অপ্রতিহত ক্ষমতাই কি তার একমাত্র কারণ? 'ভবের বাজারে সর্বস্ব অপহরণকারী কে? আর সর্বস্ব হারিয়ে ভাঙা তরী নিয়ে শূন্যঘাটে পড়ে থাকার কারণটি কি? এর পিছনে যারা আধ্যাত্মিকতা খুঁজে বেড়ান — খুঁজুন, কিন্তু আমরা জানি এর পিছনের ইতিহাসটা'। তিনি বলেন, 'যাকে আধ্যাত্মিক বলা হয়, সেই সব গানে জীবনের বঞ্চনাই ব্যক্ত।'

বাংলাতেও অন্যায় নিপীড়ন শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে অসংখ্য গান, প্রবাদ প্রবচন, শ্লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতে, সমস্যাটা অনেকটা গবেষক ও সংগ্রাহকদের, তাদের মানসিকতায়, মতাদর্শে। এই মধ্যবিত্ত, ইউরোপের চোখে দেখা ভারতকে, তার 'আত্মসমর্পণ, আধ্যাত্মিক তত্ত্বমূলক ধারাটিকেই ভারতীয় ধারা বলে সনাক্ত করেছেন।' কিন্তু তিনি অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন, 'সামান্য অনুসন্ধান করলে আজও অনেক টুকরো ছড়া, গানের ভাঙাকলি, গীতিকা'র ছিন্নমালা খুঁজে পাওয়া যায়— শুধু বাংলাদেশে নয়, ভারতের সর্বত্র'। হেমাঙ্গ বিশ্বাস অনেকগুলো দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যেখানে সিরাজদ্দৌলা, ঝাঁসির রাণী, নীলবিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, প্রজা বিদ্রোহ, সিপাহি বিদ্রোহের বিষয়ে জন অনুভূতি, উপলব্ধি আছে — আছে বিদ্রোহের এবং অস্বীকারের চেতনা। বলাই বাহুল্য, পরবর্তী সময়ে কে কোন ধারাকে গ্রহণ করবে তা নির্ভর করে তার মতাদর্শ ও সামাজিক অবস্থানের উপর।

সাংগীতিক বচনে-বাচনে

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'শঙ্খচিল' এম পি থ্রি গানের ক্যাসেট (রাগা মিউজিক কমিউনিকেশনস প্রাঃ লিঃ)-এ রয়েছে ১২টি গান। যথা - International, We shall overcome, John Brown, আমি যে দেখেছি সেই দেশ, আজাদি হয়নি তোর, শঙ্খচিল, নিগ্রো ভাই আমার ভাই, বড়ো ক্ষুব্ধ ঈশানী, ভেদী অনশন, তেলেঙ্গানা, Tamil । এছাড়া

কয়েকটি অনুবাদ গানও রয়েছে। সে প্রসঙ্গে পরে আলোচিত হয়েছে। যাইহোক, সলিল চৌধুরী মনে করেন হেমাঙ্গদার মৌলিক সৃষ্টি হিসেবে একটি গানের উল্লেখই যথেষ্ট 'শঙ্খচিলের গান' আবার তার হিরোশিমার উপর লেখা সংগীত 'সুদুর সমুদ্দুর/প্রশান্তের বুকে হিরোশিমা দ্বীপের আমি শঙ্খচিল/ আমার দু ডানায় ঢেউয়ের দোলা/ আমার দুচোখে নীল শুধু নীল'।

শান্তির শঙ্খচিল হয়ে সব সময় থাকা যায় না। 'সুদুর সমুদ্দুর প্রশান্তের বুকে' শঙ্খচিলের সংগীত সবসময় শোনা যায় না, আর সাগরিকার স্বপ্নের দ্বারও সবসময় খোলে না। কোনো না কোনো আণবিক, দানবিক মৃত্যুর নৃত্যও দেখা যায় প্রশান্ত দুহিতার বুকে, হিরোশিমা নাগাসাকিতে। সজোর বিঘোষণা শ্রীবিশ্বাসের, তাঁর 'গানে বিদ্রোহবাণ আনে/ আফ্রো এশিয়া আমেরিকায়'। কারণ তিনি যে ভিয়েতমিনের সমার্থক!

কিষাণ মজদুরদের উদ্দেশ্যে তাঁর উচ্চারণ—'আজাদি হয়নি আজও তোর' গানে —'ভাঙরে ভাঙ শোষণের বাঁধ/শোন তেলেঙ্গানার সংবাদ'। যদিও বর্তমানে তেলেঙ্গানা স্বাধীন ভারতের এক স্বাধীন অঙ্গরাজ্য। বলার কথা এই যে, ২রা জুন ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে তেলেঙ্গানা ভারতীয় অঙ্গরাজ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে। যে তেলাঙ্গানা আন্দোলনের নানা অভিমুখ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল তা আজ বাস্তবে আইনানুগভাবে, সাংস্কৃতিকভাবে, ভাষাগতভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

'আমরা তো ভুলি নাই শহীদ এ কথা ভুলবো না' গানে প্রতিবাদের ঝাঁজ। আম্বার জেলখানা যার রক্তে রাঙানো সেই মাটির সন্তান গরীব কিষাণের রক্ত নিশান পথের নিশানা বাৎলে দিয়েছে অন্যদের। 'ভুলবো না, ভুলবো না' গানেও এই ধরনের তেজালো ঝাঁজ - 'মহানগরীর রাজপথে যত রক্তের স্বাক্ষর,/অগ্নিশিখায় অঙ্কিত হলো লক্ষ বুকের পর/আমরা ভুলবো না'। তাঁর মতে কিষাণ মজদুর, শ্রমিক জনতা বর্তমানে যথেষ্ট শক্তিধর। এরা চ্যালেঞ্জ জানাতে বদ্ধপরিকর— 'সর্বহারা আজ সেনাদল/শ্রমিকের পাঞ্জায় তলোয়ার/ জনগণ নহে আর হীনবল—/দুনিয়ার খুনিদল হুশিয়ার' (মুক্তি শিবিরে হাঁকে বিউগল)

দেশভাগ, মাটির টান, স্মৃতিচারণাজনিত মানসিক যন্ত্রণা ইত্যাদি শ্রী বিশ্বাসের গানে বিগর্লিত। পদ্মা নদীর মাঝিদের পদ্মা-প্রীতি বাংলা বন্যায় গানে — পানির লগে জালোয়ার পীরিত পানিত কিবা ডর। গীতিকার তো বোঝেন', মাঝি পাগলি পদ্মার পীরিতে তোরে কেনে এমন টানে। আবার 'সুরমা নদীর ধারে' ক্যাসেট) দে'জ পাবলিশিং-(এ দশটি ভাটিয়ালি গানের মধ্যে তিনটি স্বরচিত। যথা - 'আমার মন কান্দে পদ্মার চরের লাইগ্যা', 'সোনা বন্ধুরে'..., 'হবিগঞ্জের জালালি কইতর' এবং অন্যগুলি প্রচলিত ভাটিয়ালি সংগ্রহ। 'আমার মন কান্দে পদ্মার চরের লাইগ্যা' মূলত ১৯৪৭-এর দেশভাগের, বাংলা ভাগের বিষাদ স্মৃতির গান। 'হবিগঞ্জের জালালি কইতর' গানে বিষাদ স্মৃতি থাকলেও প্রতিবাদের ঝাঁজই বেশি। অবশ্য 'পদ্মা কও, কও আমারে' অনুরূপ দেশবিভাগজনিত বিষণ্ন স্মৃতি ও মেজাজের। দেশভাগের পর নস্টালজিক গীতিকার ভাটিয়ালিতে লিখলেন তিনি 'পদ্মা কও, কও আমারে'। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পর সিলেট, হবিগঞ্জ পরভূমি হয়ে

যায়। এই মর্মবেদনা তাঁকে জীবনভর কাঁদিয়েছে। পদ্মা 'কীর্তিনাশা কুলভাঙা' নয়। সে 'ভালবাসা, স্বপ্ন আশা' যাকে 'বিভেদের বালুচরে' ভেঙে ফেলে যে সর্বনাশারা', চিন্‌লিনা তারে'। পদ্মার পাড়, চর বা বালুচরের জন্য ভারতে আসা গীতিকারের 'মন-কান্দে'। এ নদীর পাড় একসময় গীতিকারের ছিল 'শান্তির গৃহ সুখের স্বপন'। কিন্তু একদা কে দিল ভাঙিয়া! শুধু তাই নয়, তাঁর 'অন্তর কান্দেরে পোড়া দেশের লাগিয়া'। বর্তমানে পশ্চিম ও পূর্ব বাংলা তাঁর মতে পৌরাণিক মিথের মতো - বেহুলা-লখিন্দর, খন্ড বাংলাভূমি রূপ বেহুলা, যার 'বিষের জ্বালা অন্তরে' : 'আজ কূলে আমার লক্ষিন্দর/ বিষে অঙ্গ জরজর/ আমি বেহুলা ভেলায় চলেছি ভাসিয়া'।

দেশভাগের যন্ত্রণা অনেকসময় উচ্চারিত ব্যঙ্গের আভাসে—'হিন্দুস্থানে শ্বশুরবাড়ি পাকিস্থানে ঘর/ মধ্যিখানে ভূতের ময়দান বউ যে হইল পর।।' কিন্তু গম্ভীরভাবে ভাবলে নোম্যান্স ল্যান্ডের সংকট এখানে অভিব্যক্ত। প্রসঙ্গত মনে পড়তে পারে সাদাত হাসান মান্টোর গল্প 'টোবা টেক সিং'-এর এ ধরনের অনুষঙ্গ।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতাকে ভুয়া হিসেবে গণ্য করে বড়লাট মাউন্ট ব্যাটেনকে ব্যঙ্গ করেছেন শ্রী বিশ্বাস। তা করেছেন এভাবে - 'মাউন্ট ব্যাটেন সাহেব ও/ তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে/ থুইয়া গেলায় ও'। এই গানে দেখা যায় ব্যঙ্গাত্মক উচ্চারণ— 'সর্দার কান্দে, পন্ডিত কান্দে, কান্দে মৌলানায়', 'কান্দে গোপালাচারী', তথা 'গোপাল রাজ চক্রবর্তী'। লর্ড মাউন্ট ব্যাটনের ভারত ত্যাগের সময় রচিত 'শুন শুন শুন সবে শুন দিয়া মন (ভালো বেশ বেশ)' গানটি। এই গানের কথায় রয়েছে স্বরাজের মাহাত্ম্য কথা। স্বরাজ দেবী 'অখন্ড দেশের মুন্ড করিলেন ছেদন'। তৎকালীন দেশীয় পরিস্থিতিতে 'চল্লিশ টাকায় ওঠে চালের মণ'। অতঃপর মাউন্ট ব্যাটনের প্রতি তাঁর ব্যঙ্গ— 'জয় জয় রঘুপতি রাঘব মাউন্ট ব্যাটন'। তারপর রয়েছে 'মজুর কিষাণ হ্যায় নিমক হারাম/ মুঝকো মুনাফা দে ভগবান।।' মোটকথা, ব্যঙ্গ শ্লেষে মাউন্ট ব্যাটেনকে বিদ্ধ করার প্রয়াস এ গানে লক্ষণীয়।

দেশভাগের বিষাদ স্মৃতি এড়িয়ে বাঁচার গানও উচ্চারিত। 'লঙ্গর ছাড়িয়া নাও-এর দে দুঃখী নাইয়া'। নতুন দিনের জন্য বিভেদ নদীর দুই কূল বেঁধে আবার সর্বহারা নিঃস্ব বাস্তুহারা দীন-দুঃখী অভাগার দল 'মিলে তালে তালে আনন্দের গান 'মিলনের গান আবার গেয়ে, নতুন বাংলা গড়ার আশ্বাস শোনা যায় গীতিকারের 'বাঁচাবো বাঁচবোরে আমরা' গানে।

স্বাধীনতার আগে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের গানের সুরকারদের মধ্যে শ্রীবিশ্বাসই ছিলেন প্রধান। সেই সময়ে তাঁর গান তোমার কাস্তেটারে দিও জোরে শান, কিষাণ ভাই তোর সোনার ধানে বর্গী নামে প্রভৃতি আসাম ও বাংলায় সাড়া ফেলেছিল। আসামে তাঁর সহযোগী ছিলেন বিনোদবিহারী চক্রবর্তী, সাহিত্যিক অশোকবিজয় রাহা, সেতারবাদক কুমুদ গোস্বামী প্রমুখ। এই গান তেভাগা আন্দোলনজাত। খাদ্য আন্দোলনের প্রায় সমকালে তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়। চাষিরা শস্যের দুভাগ পাবে, মালিক পাবে একভাগ। এই তেভাগা আন্দোলনের একটি গান- 'তোমার কাস্তেটারে দিও জোরে শান/ কিষাণ ভাই

রে, কাস্তেটারে দিও জোরে শান'। 'এক হয়ে আজ দাঁড়াও দেখি মজদুর কিষাণ'। যেহেতু 'একতায় ভাই চিনের মানুষ হল বলীয়ান'। অতএব সাহসী বাণী উচ্চারণ, 'দস্যু যদি লুঠতে আসে কাটবে তাহার জান-রে। 'তোর মরা গাঙে আইলো এবার বান' গানেও অনুরূপ প্রতিজ্ঞা— 'যায় যদি যায় যাক্‌নারে প্রাণ/দিব না তো ধানরে'। 'চারিদিকে আজ মিলছে জনগণ/ হাজং, টিপরা, মনিপুরী, সাঁওতালী বর্মন—রে'। এদের মৃত্যুর ফলেই হয়তো একদিন 'মাটির ছেলে হবে খাঁটি মাটির মালিকান'।

১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ খাদ্য আন্দোলন শুরু হয়। বামপন্থীদের নেতৃত্বে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের 'মাইলো' খাওয়ার পরামর্শে আগুনে যেন ঘি পড়লো। খাদ্য আন্দোলনের শহীদদের উদ্দেশ্যে সমব্যথীর মতো তিনি গান লেখেন— 'গুলিবিদ্ধ গান যে আমার খুঁজে খুঁজে মরে'। 'সান্ধ্য আইনের কুটিল অন্ধকারে/কৃষ্ণনগর হতে যায় যে কোন্নগরে/ঘুরে আউলি হয়ে বসিরহাটে/ইছামতীর চরে'।

'উদয়পথের যাত্রী'র ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তাঁর মশাল জ্বালার আহ্বান বিঘোষিত। কারণ আঁধারে আচ্ছন্ন শিক্ষাবিহীনদের ও অন্যান্যদের দুরবস্থা। গীতিকারের পরামর্শ - 'ভুলি ভেদাভেদ অন্ধ আবেগ, হাতে হাত মিলাও/ধনপিপাসায় মূঢ় হতাশায় আগুন জ্বালো'। 'আমরা যুগের স্বপ্ন ওরে' গানে বীর কিশোর দলের জয়গান ধ্বনিত। 'আমরা কিরে দেখব বসে মায়ের চোখের জল;/চীন রাশিয়ার বীর কিশোর/ দেশের লাগি লড়ছে জোর/ তাদের হাতে হাত মিলায়ে লড়ব মোরা চল'। 'পাহাড় টলানো বীরদল'-এর কথা বিদ্যমান 'কারাগার বন্দী' গানে।

তাঁর গানের মূল ধারা রাজনৈতিক হলেও আর্ত মানবতার জন্য সেবামূলক গানও তিনি লিখেছেন। তাঁর জন্মভিটে হবিগঞ্জের বানিয়াচঙের মানুষ চল্লিশের দশকের প্রথমদিকে ম্যালেরিয়ায় উজাড় হয়ে গেলে স্বরচিত গান নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ান। 'বাইন্যাচঙে প্রাণ বিদরায় ম্যালেরিয়া মহামারী/হাজার হাজার নরনারী মরছে অসহায়/শান্তিভরা সুখের গেহ/শূন্য আজি নাইরে কেহ/মৃত সন্তান বুকে লইয়া কান্দে বাপমায়'। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় লেখা তাঁর গান 'হায়- হায়! ঘোর কলিকাল আইল আকাল সোনার তাঁর বাংলায়'। 'অন্ন লইয়া নর-কুকুরে করে কাড়াকাড়ি'। 'নর-কঙ্কাল খাদ্য খোঁজে ময়লা নর্দমায়', 'মায়ের কোলের শিশু-সন্তান মরে অনাহারে'। এই অবস্থায় সমকালীন পরিস্থিতি ব্যঞ্জিত- 'দেশের সরকার করিছে বেইমানী/ এই সুযোগে হামলা করে দস্যু জাপানী।' এভাবে দেখলে সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ গীতিকারের লেখনী ধারণ কম কথা নয়!

স্বামী সোহাগির সন্তানবৎসলা ঘরোয়া কুলবতী বাঙালি নারীর ঘরকে কে বা কারা বিনষ্ট করল! 'বাংলার বধূ বুকে মধু, অমৃতের খনি' সেই বুকে কে বা কারা দংশালো! হায় দেশবাসী, লাম্পট্যে ব্যাভিচারে দেশমাতা কূলটা হলে সমাজের হাল যে বেহাল হতে বাধ্য। শুধু তাই নয়, বাংলা-মাও 'অভাগী' হতে বাধ্য। কারণ মায়ের 'শস্য শ্যামলা প্রান্তরে কালো মৃত্যুর পরিক্রমা' এবং আমরা দেশবাসীরা 'ভুলেছি জনশক্তির মহিমা' (গান— বেহুলার ভেলায় যায় ভেসে যায়)। 'এই মাটির এই ধূলিকণায় কতো রক্তরেখা'-র ইতিহাস।

তবু মা-টি হিসেবে দেশের মাটির জয়গান গীতিকার গাইতে বদ্ধপরিকর।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভাষা আন্দোলনের প্রভাব তাঁর গানে লক্ষণীয়। এইপথে ঢাকা রাজপথে ছাত্রদের রক্তপাত নিয়ে তিনি লিখলেন- 'শোনো দেশের ভাই-ভগিনী, শোনো আচানক কাহিনী/ কান্দে বাংলা জননী ঢাকা শহরে'। ১৯৭১-এ স্বাধীনতা পায় বাংলাদেশ, যখন তিনি মাস সিঙ্গারস দল বানাচ্ছেন গ্রামে গ্রামে গান প্রচারের জন্য।

'জালিয়ানাবাগের জালালাবাদের এসেছে আদেশ' গানটি ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির কোলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অধিবেশনের প্রারম্ভ গীত, যেটি বিনয় রায়ের নেতৃত্বে গীত হয়েছিল। 'ধ্বংসের দানবেরা মিলায়েছে হাত/স্বদেশে, বিদেশে মিলে এক সাথ/ হানো শেষ আঘাত,.../ বিষাক্ত নাগিনীরে কর নিঃশেষ'।

১৯৪৬-এ আরব সাগরে বোম্বাই (অধুনা মুম্বাই) বন্দরে 'খাইবার' নামক নৌকার নৌসেনারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য গানের কলি — 'নীল সমুদ্র লাল করে গেল/ নাবিকের রক্তধারা'। এই ডাকের প্রসার তৎকালীন মহানগর কোলকাতায়। উত্তাল ঢেউয়ে কল্লোলিত।

ভাষা-সংস্কৃতির দিক থেকে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান মূল্যবান। কারণ তাঁর প্রয়াসে অসমিয়া ভাষা, মান্য বাংলা, চিনা ভাষার গান প্রাপ্ত। তাছাড়া মান্য বাংলা ভাষায় বঙ্গালী উপভাষা, সিলেটী বিভাষা, চিনা, হিন্দি [যেমন 'মনজিল' (গন্তব্য)] বুকনি ইত্যাদি প্রাপ্তব্য। ' আমি যে দেখেছি সেই দেশ' গানে 'উজ্জ্বল সূর্য-রঙিন' দেশ চিনের সমাজ-সংস্কৃতির বিগর্ভন লক্ষণীয়। চিনের সিনকিয়াং প্রদেশের উইঘুর উপজাতির একটি বিখ্যাত লোকসংগীত সুর অবলম্বনে গানটি রচিত। চিনের দুটি বৃহৎ ইস্পাত কেন্দ্র 'আনসান', 'উহান', সমাজতন্ত্রী কৃষির আদর্শ কেন্দ্র 'তাচাই', আদর্শ তৈল উৎপাদন কেন্দ্র 'তাচিং', এদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের রেশমি লণ্ঠন 'কুংতান', স্বর্গীয় শান্তির দ্বার বা 'থিয়েন আন মান', বন্যাহীন নদী হোয়াংহো, ইয়াংসি ইত্যাদির উল্লেখ আলোচ্য গানে যেমন লব্ধ তেমনি লব্ধ এদেশের 'চোখে বিশ্বের আলো - শঙ্কাবিহীন'। আজও বিশ্বে প্রযুক্তিনির্ভর শ্রমজীবীদের আদর্শ দেশ চিন।

চিন দেশের নানা ধরনের গান তিনি অনুবাদ করেছেন, যেমন চিনের হিঙ্গাই প্রদেশের একটি লোকগীতি - 'একটি লোকগীতি : দূর নীল পাহাড়ের গায়ে ঘেঁষা গাঁয়ে'। লিউ-উ-য়ান-এর কথা তাঁর অনুবাদে 'পূবদিক লাল সূর্যের আভায়/ বিশ্বের শোষিতের মন রাঙায়', তার নাম চীনের রূপকার - মাও সে তুঙ।

'ধীরে বহে ইয়াংসি'-তে ইয়াংসি নদীর প্রবাহে অপরিমেয়তা অপরাজেয়তা রয়েছে। রণসজ্জা, অশ্রুধারা, অন্যায়, মৃত্যুকে অতিক্রম করে এর ভেসে চলার বীরগাথার ইতিহাস রচনাও বিদ্যমান। মিসিসিপি গঙ্গা নীল-নদী জলে/ তব ঢেউ উদ্দাম এলো এলো কল্লোলে, ত্রিধারা সে মহানদী...'।

মাও সে তুঙ-এর জন্ম স্থান হুনান প্রদেশের শাওশান, যে স্থান পাহাড় ঘেরা, পদ্মপুকুর সমন্বিত। এই স্থানে গীতিকার শ্রীবিশ্বাস গিয়েছিলেন। গানও লিখেছিলেন এ

সম্পর্কে - 'আমি যাই শাওশান'। মাও সে তুঙ-এর মহাপ্রয়াণে শ্রী বিশ্বাসের গান- 'আরো বসন্ত, বহু বসন্ত/ তোমার নামে আসুক/ তুমি তো সূর্য অস্তবিহীন/চির-জাগরূক।।' অন্য গানও প্রসঙ্গত বিদ্যমান - 'এই সমাধিতলে কত প্রাণপ্রদীপ জ্বলে'। তিব্বতি অজ্ঞাতনামার কথার 'একটি তিব্বতি গান' অনুবাদে 'হাতা' (তিব্বতি প্রথা মেনে স্বাগতম জানানো হয় যে নতুন কাপড়ের টুকরো দিয়ে), 'ছ'... ইলিয়াছ ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

তাঁর অনুবাদ গানগুলি নানা ভাষা থেকে। কর্নেল আলেকজান্দ্রীভ-এর কথা অনুবাদ করেন 'ভেদি অনশন মৃত্যু তুষার তুফান' গান। গানটি প্রাণের রসদ যুগিয়েছিল লাল পল্টনকে, অক্টোবর বিপ্লবজাত শ্রমিক শ্রেণির প্রথম রাষ্ট্র রক্ষার যুদ্ধে। রাশিয়ার লেলিন প্রসঙ্গসহ অনুবাদটির শেষ চরণ- 'শ্রমিক পতাকা উড্ডীন'। অজ্ঞাতনামার কথার অনুবাদ গান 'ঝঞ্ঝা ঝড় মৃত্যু ঘিরে আজি চারিদিক'। বিশ শতকের প্রথমদিকে তখন পোল্যান্ড রাশিয়ার অধীন, এই পোল্যান্ডের ওয়ারশ নগরের শ্রমিকশ্রেণির জারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ থেকে গানটির জন্ম। রুশ ভাষায় এ গানের নাম 'ভার্‌শাভিয়াঙ্কা'। এটি লেনিনের জনপ্রিয় গানের মধ্যে অন্যতম। অনুবাদটির শেষাংশ - 'বিশ্বের অধিকারী শ্রমজীবী সন্তান/ মানুষের মুক্তির দিন আগত'। অজ্ঞাতনামার কথাকে অবলম্বন করে ভিয়েৎনামী মুক্তিফৌজের গান অনুবাদ - 'এগিয়ে চল মুক্তি সেনা দৃঢ় পদক্ষেপে' - তে সাম্রাজ্য 'ইয়াঙ্কি', নদী 'মেকং', পাহাড় 'ট্রুয়ংসং', 'আখেরী জং', 'ভিয়েতকঙ' ইত্যাদি লক্ষণীয়।

অজ্ঞাতনামার কথা 'Sailing in the seas depends on the Helmsman'- র অনুবাদ গান 'সাগর যাত্রা নাবিক নির্ভর'। ইংরেজি গানটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় জনপ্রিয়তা পায়। এ গানে মাও সে তুঙ-এর সঙ্গে বিপ্লব, কম্যুনিস্ট দল ও জনতার বন্ধন ব্যঞ্জিত। মাও সে তুঙ-এর শোষক বিনাশের কথা তাঁর একটি অন্তঃমঙ্গোলীয় লোকগীতের অনুবাদে পাওয়া যায়- 'মাও সে তুঙ আর কম্যুনিস্ট দল/ শোষকেরে করেছে নির্মূল (টগবগ টগবগ ধাবমান অশ্বখুরে)। অজ্ঞাতনামার কথার অনুবাদ বারো টুকরোর গান 'নাম তার ছিল জন হেনরী'। উনিশ শতকের সত্তর দশকের একটি সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে গানটির জন্ম। গানে সব দেশের আখ্যানের সঙ্গে কিংবদন্তি মিশে যায়, কোনো এক সময়ে কোনো এক অজ্ঞাত রচয়িতা নতুন কিছু কথা-সুর জুড়ে দিয়ে থাকে। এ গানেও তা-ই হয়েছে বলে মনে হয়। এ গানের পাঠের ভিন্নতা আছে আমেরিকার নানা লোকসংগীত সংকলন পুস্তকে। প্রখ্যাত মার্কিন গায়ক মনে করেন, গানটি আমেরিকার 'Nobelest Ballad' বা মহত্তম গীতিকা। কথা ও সুর অজ্ঞাত হলেও তাঁর অনুবাদ গান আমাদের কাছে সুপরিচিত। যেমন 'জন ব্রাউনের দেহ শুয়ে সমাধিতলে'। এই জন ব্রাউন (১৮০০-১৮৫৯) দরিদ্র শেতাঙ্গ বিপ্লবী, যিনি বর্ণ বিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রথম প্রাণ আহুতি দেন কৃষ্ণাঙ্গ নরনারীর সঙ্গে। 'নিগ্রো মুক্তির তরে জন ব্রাউনের আত্মদান তাঁর আত্মা বহ্নিমান'। অজ্ঞাতনামার গান 'We shall overcome'- এর জন্ম আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গ ও শেতাঙ্গদের ঐতিহাসিক সমাবেশগুলির মধ্যে, বর্ণ বিদ্বেষের বিরুদ্ধে এবং কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের নাগরিক অধিকারের দাবিতে। এই গানের অনুবাদ 'আমরা করব জয়/ আমরা করব জয়

নিশ্চয়' আজও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বাঙালির জনপ্রিয় সমবেত সংগীত। বাঙালির স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কণ্ঠেও প্রয়োজনে গীত হয়ে থাকে। ভোট প্রচারের ময়দানে, দুপক্ষের খেলা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে এ গান আজ প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

তিনি কল্লোল, তীর, লাল লণ্ঠন প্রভৃতি নাটকের সংগীত পরিচালক ছিলেন। লাল লণ্ঠন নাটকে তিনি বিভিন্ন চিনা সুর ব্যবহার করেছিলেন। উৎপল দত্তের কল্লোল নাটকের প্রস্তাবনা গীত 'বাজে ক্ষুব্ধ ঈশানী ঝড়ে রুদ্র বিষাণ' (দুরান্বয় ঠিক করলে দাঁড়ায়— 'ক্ষুব্ধ ঈশানী ঝড়ে' 'বাজে রুদ্র বিষাণ') তাঁরই সৃষ্টি।

বিশ্বাসাঙ্গের মূল্যায়নে

গণ সংগীত আন্দোলনের সংগঠক হিসেবে জনগণের সংগ্রামী প্রত্যয়কে কালোত্তীর্ণ সুরের মাধ্যমে তিনি নতুন ধারার জন্ম দিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিবাদী গণমানুষের গান এখনো শিরায় রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয়। বাংলার মাটি আলো হাওয়া থেকে রসদ সংগ্রহ করে গণসংগীতকে যে উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি তার তুলনা আজও করাঙ্গুলি গণনীয়।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস তাঁর গানগুলোর কোনটি নিজে রচনা ও সুরারোপ করেছিলেন, কোনটি সংগ্রহ করেছিলেন লোকসংগীতের ভান্ডার থেকে, কোনটি কিছুটা পাল্টে নিয়ে চলতি লড়াই-এর সাথে যুক্ত করেছিলেন। গণসংগীত একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে রচিত হয় নিশ্চয়ই, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে একটি গণসংগীত যদি মানুষ ও তার লড়াইয়ের প্রাণ ধারণ করতে পারে তাহলে তা দীর্ঘদিন অন্যান্য লড়াইকেও উজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়। কারণ শোষণ পীড়ন, বৈষম্য আর নিষ্পেষণ, অপমান বঞ্চনার বিরুদ্ধে কান্না ক্রোধ ও প্রতিবাদ, কিংবা মানুষের স্বপ্ন, সাহস এবং আরও অসংখ্য মানুষের সাথে মৈত্রী সংহতির গান মানুষকে স্পর্শ করবেই। সেজন্য হেমাঙ্গ বিশ্বাস আমাদের কাছে এখনও কিছুটা হলেও জীবন্ত এবং স্মরণীয়।

'ওরা আমাদের গান গাইতে দেয় না', 'কাস্তেটারে দিও জোরে শান', 'শঙ্খচিল', 'শহীদের খুনে রাঙা পথে, দেখো হায়েনার আনাগোনা', 'সাম্যের গান গেয়ে রেল চলে', 'আরো বসন্ত বহু বসন্ত', 'আজব দেশের আজব লীলা', 'মাউন্টব্যাটেন মঙ্গলকাব্য', 'আমরা তো ভুলি নাই শহীদ' এখনও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের বিভিন্ন লড়াইয়ে, মিছিলে, সমাবেশে গাওয়া হয়। এই গানগুলোর কোনো কোনটি পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী কথা কিছুটা পাল্টেও নেওয়া হয়। বলাই বাহুল্য, নতুন নতুন এই ধরনের গান ও শিল্পী এই ধারায় ক্রমে যুক্ত হচ্ছেন। ভাষা ও সুরে অবশ্য অনেক বৈচিত্র্য এসেছে, পরীক্ষা নিরীক্ষাও চলছে।

জনসমুদ্রের ভেতর থেকে মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শৃঙ্খলমুক্তির আকাঙ্ক্ষার সরব প্রকাশ আমরা নতুন শিল্পী সংগ্রামীদের কথা ও গানে দেখতে পাই। গণ আন্দোলনের বিস্তার স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে না। তার প্রথম শর্ত দাসত্ব ও শৃঙ্খলকে অস্বীকারের চেতনা। এই চেতনাই আবার অন্যদিকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কেন্দ্রীয় বিষয়, গণসংগীতের প্রাণ। এর সাথে যুক্ত উদ্যোগ, সংগঠন ও বিপ্লবী রাজনীতি। পুঁজির সর্ব্বব্যাপী চরম

আগ্রাসনের মধ্যেও আমরা এর স্পষ্ট সাক্ষর পাচ্ছি গানে, লড়াই-এ। এখনও তৈরি হচ্ছে কিছু না কিছু নতুন গান, নতুন প্রাণের বাণী এবং গীতিকার হেমাঙ্গ বিশ্বাসের যোগ্য উত্তরসূরী।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বহুসংখ্যক টিভি চ্যানেল, এফ.এম রেডিও, ইন্টারনেট পরিষেবা ইত্যাদি সচল। সিডি, ডিভিডি তৈরি করবার অনুকুল পরিস্থিতিও রয়েছে। কিন্তু এধরনের গানের জগতে বিনিয়োগ ক্রমশ কমছে। গানের জগতে নানা পরিবর্তনও আজ লক্ষণীয়। পপ (pop), রক (rock) হিফহফ (hip-hop) , র‍্যাফ (raff), ব্র্যান্ড (brand), ইত্যাদি সংগীতের সংরূপ (genre)- এর আধিপত্যে গণসংগীত আজ হয় কোণঠাসা, নয় আন্তঃপ্রকৃতি, ভাব-ভাষা ও মেজাজে অন্য ভাবে-রূপে অনেকটাই পরিবর্তিত। ফলত গীতিকার হেমাঙ্গ বিশ্বাসদের মতো গণসংগীত রচয়িতাদের প্রত্যক্ষ চাহিদা ক্রমহ্রাসমান।

গীতিকার হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গানের সীমাবদ্ধতাসমূহও অনেক ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। যথা কাব্যিক শব্দ ব্যবহার, গুরুচন্ডালী দোষ, অনেকক্ষেত্রে মিলের অভাব ইত্যাদি লক্ষণীয়। কাব্যিক শব্দ ব্যবহার যেমন 'তরে' ইত্যাদি তাঁর গানে দেখা যায়। অধিক উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন।

কাঠামো বজায় রেখে শব্দ বিকল্পন তাঁর অনেকগানে লক্ষ্য করা যায়। অতএব মৌলিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। সলিল চৌধুরী মনে করেন, অনেক ক্ষেত্রে প্রচলিত লোকসংগীতে উনি কথা বসিয়েছেন, 'বলতে পারবে না যে এটা হেমাঙ্গদার নিজস্ব সৃষ্ট সুর' (গান প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকার)। বলা প্রয়োজন যে, প্রচলিত গানই কীভাবে পরিস্থিতির টানে পাল্টে গিয়ে আরেক রূপে হাজির হতে পারে তা দেখিয়েছেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। যেমন তিনি দেখেছেন, সারিগানে শোনা যেত— 'সাবধানে গুরুজীর নাম লইওরে সাধুভাই/ সাবধানে গুরুজীর নাম লইও'। সেখানে শোনা গেল— 'কাস্তেটারে দিও জোরে শান কিষাণ ভাই রে/ কাস্তেটারে দিও জোরে শান'। কিংবা ভাটিয়ালিতে পরিচিত কথার জায়গায় শোনা গেল - 'ফিরাইয়া দে, দে, দে মোদের কায়ুর বন্ধুদের/মালাবারে কৃষক সন্তান/ তারা কৃষক সভার ছিল প্রাণ/ অমর হইয়া রহিবে দেশের অন্তরে'। তাহলে মৌলিকতা কোথায়?

অবশেষের নটে গাছটি

অবশেষে বলা প্রয়োজন যে আজও চারিদিকে শোষিত আম আদমির আর্ত কণ্ঠস্বর। একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকেও নেপথ্যে নানা ধর্মান্ধ জঙ্গিসংগঠন, পেটি বুর্জোয়া, তথা শোষক-অত্যাচারীরা বিদ্যমান। এখনও ধর্ষণ, খুন-হত্যা ইত্যাদি চলছে। কাজেই এই অত্যাচারকারীদের প্রতিহত করতে, প্রতিবাদ করতে শ্রী বিশ্বাসের গানের প্রয়োজনীয়তাও এখনও ফুরিয়ে যায়নি, আরও কিছুকাল হয়তো ফুরাবেও না। আলোচ্য প্রবন্ধে আলোচনার প্রয়াস করেছি মাত্র আমরা গণবৈপ্লবিক উদ্ভাসে আলোকিত গীতিকার হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও তাঁর ত্রুটিবিচ্যুতি, প্রভাবসহ নানা দিক নিয়ে।

টীকাসূত্র

১. গৌতম ঘোষ পরিচালিত ও পশ্চিমবঙ্গীয় অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, বাংলাদেশী অভিনেত্রী কুসুম শিকদার অভিনীত 'শঙ্খচিল' নামক সামপ্রতিক চলচ্চিত্রটি বর্তমানে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে।

গ্রন্থঋণ

১. শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য : কবিতার অন্বয় সাংগীতিক প্রতিভাস, ২০০৯, ইন্দাস পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ১-৩৫

২. সুব্রত রুদ্র সম্পা : গণসংগীত-সংগ্রহ, ২০০৯, চতুর্থ মুদ্রণ, নাথ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ৪৯ - ৬৭, ৩৯৭ - ৪০৪

৩. স্বপন সোম : বাংলা গানের স্বর্ণযুগকে স্পর্শ করা যায়, দৈনিক আ ব প পুস্তক পরিচয়, তাং ১৯/০৩/২০১৬, পৃ - ৪

৪. লেখকের কয়েকটি প্রকাশিত প্রবন্ধ ও তৃতীয় বৎসর পর্যন্ত তবলা বাদ্য প্রশিক্ষণ (বঙ্গীয় সংগীত পরিষদ), কয়েকটি আন্তঃজালিক সাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য, দু একটি ইংরেজি ও বাংলা অভিধান ইত্যাদি সহায়ক হয়েছে।